বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১০

সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

তাসনিম সিদ্দিকী

RMMRU

২০১০ সালে অভিবাসন সেক্টরে অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ

তাসনিম সিদ্দিকী
রামরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়[১]

বিভিন্ন ধরনের বৈরী পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলার পরও সামাজিক ও অর্থনেতিক অগ্রগতির কারনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বাংলাদেশ স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর তালিকায়। এর ন্যূনতম মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি সচল থাকলেই আগামী দেড় দশকের মধ্যে বাংলাদেশ পরিণত হতে যাচ্ছে একটি মধ্য আয়ের দেশে। বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধি অর্জনে যে কয়েকটি সেক্টর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, অভিবাসী ও অভিবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের উন্নয়নকে বেগবান রাখতে এই অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অত্যন্ড় জরুরী। গত এক দশকে বিভিন্ন সরকার এক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এই রিপোর্টে আমরা ২০১০ সালের অভিবাসন সেক্টরের অর্জন এবং চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরছি।

বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসন ধারা ২০১০

পরিসংখ্যান

বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৬ হতে এ পর্যন্ড় স্বল্পমেয়াদী চুক্তিতে কাজের উদ্দেশ্য বিদেশে গেছেন ৭.৬ মিলিয়ন বাংলাদেশী। এছাড়াও বাংলাদেশের রয়েছে ১.৫ মিলিয়ন দীর্ঘমেয়াদী অভিবাসী। বিশ্বমন্দা উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ২০০৯ সালে পূর্বের বছরের তুলনায় অভিবাসন ১৭.৮৬% কমে যায়। তারপরও প্রায় পৌনে পাঁচ লক্ষ লোক সে বছরে কর্মের উদ্দেশ্যে অভিবাসন করেন। ২০১০ সালে এশিয়ার অন্যান্য প্রেরণকারী দেশ তাদের অভিবাসী পাঠানোর হার পূর্বের বছরের সমান রাখতে সক্ষম হলেও বাংলাদেশে তা ২১% কমে গেছে। ২০০৩ সালে নারী অভিবাসন হতে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার পর হতে, নারী অভিবাসন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে নারী অভিবাসন ১১.৭৬% বেড়েছে। এ বছরের নারী অভিবাসীর সংখ্যা মোট অভিবাসীর ৬.৬০%। স্বল্পমেয়াদী, চুক্তিভিত্তিক অভিবাসনের নিয়মই হচ্ছে, কিছু ব্যক্তি অভিবাসিত হবেন আবার কিছু ব্যক্তি অভিবাসন শেষ করে দেশে ফিরবেন। এ বছরে চুক্তিভিত্তিক অভিবাসন শেষ করে বা না করে দেশে ফিরে এসেছেন ৪১,২২০ জন কর্মী। বাংলাদেশী কর্মীরা মূলত আধাদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ বাজারে অংশগ্রহণ করে। ২০১০-এ যারা বিদেশে গেছেন তাদের ০.০৮% পেশাজীবি, ১৭.৮৪% দক্ষ, ৪.২৫% আধাদক্ষ এবং ৬৪.০০% স্বল্পদক্ষ কর্মী। ২০০৯ এর তুলনায় ২০১০-এ দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে এবং অদক্ষ কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে।

[1] Press Conference paper on Labour Migration 2010: Achievements and Constraints, Orgnised by: Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU)

অভিবাসনের দেশ সমূহ ও উৎস এলাকা

এ বছরে সবচাইতে বেশী অভিবাসী গেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৫২.২৭%। ১১% গেছেন ওমানে এবং ৯% সিঙ্গাপুরে। ১৯৯৯ হতে ২০০৪ পর্যন্ড় ৬০ থেকে ৭০ ভাগ অভিবাসীর গন্ড়ব্য ছিল সৌদি আরব। ২০০৯ সালে এটি ৩% নেমে এসেছে আর ২০১০-এ মাত্র ২% অভিবাসী সৌদি আরবে গেছেন। অর্থনৈতিক মন্দা পরবর্তীতে ২০১০-এ মালয়েশিয়া আবার অভিবাসী কর্মী নেয়া শুরু করে। দুর্ভাগ্যবসত তারা নেপাল ও শ্রীলংকা হতে কর্মী নিয়েছে, বাংলাদেশ হতে নেয়নি। ২০০৭-০৮ সালে যারা মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন, তাদের ৩ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে এ বছর বা সামনের বছর। সকলেই চেষ্টা করছেন চুক্তি নবায়ন করতে। যাদের চুক্তি নবায়ন হবে না তারা দেশে ফিরবেন ২০১১ সালে। অভিবাসনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সামাজিক নেটওয়ার্কের সূত্র ধরে বিশেষ বিশেষ অঞ্চল হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের মোট ৬৪টি জেলা হলেও মূলত ৬টি জেলা হতে অভিবাসন বেশী হয়। এগুলো হল চট্টগ্রাম, কুমিলণ্ঢা, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ঢাকা।

রেমিটেন্স

গত ৩০ বছরে বাৎসরিক রেমিটেন্স ১০% এর উপরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি অর্থনৈতিক মন্দার পরও ২০০৯ সালে রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ২০১০ এর দ্বিতীয়ার্ধে রেমিন্টেস নেতিবাচক গ্রোথ শুরু হয়। ২০০৯ জানুয়ারী হতে ২০১০ নভেম্বর পর্যন্ত তুলনা করলে ২০১০ নভেম্বরে রেমিটেন্স মাত্র ১.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। রেমিটেন্সের বৃদ্ধির হার কমে গেলে বাংলাদেশের মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবার স্বপ্ন পিছিয়ে যাবে। ২০১০ সালে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারী দেশ সৌদি আরব, ২য় সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৩য় ইউএসএ এবং ৪র্থ কুয়েত। ব্যাংকগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় সরকারী বাণিজ্যিক বাংকের তুলনায় বেসরকারী ব্যাংকগুলো রেমিটেন্স আহরণে বেশী সাফল্য লাভ করেছে। রেমিটেন্স আহরণের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ১ম, অগ্রণী ব্যাংক ২য়, সোনালী ব্যাংক ৩য়, ন্যাশনাল ব্যাংক ৪র্থ এবং জনতা ব্যাংক ৫ম অবস্থানে রয়েছে।

রিক্রুটিং এজেন্সী

২০১০ সালে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সীর সংখ্যা ৮৯১টিতে উন্নীত হয়। এ বছরে নতুন লাইসেন্স পেয়েছে ৫৬টি এবং বিভিন্ন কারনে লাইসেন্স বাতিল বা অন্যান্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ২৭টির ক্ষেত্রে। রিক্রুটিং এজেন্সীগুলোকে দায়বদ্ধ করার পাশাপাশি ভাল সেবাদানের জন্য তাদের সম্মানিত করার কর্মসূচি সরকারের থাকা প্রয়োজন।

আইনগত ও প্রতিষ্ঠানিক রিফর্ম

বহির্গমন অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ রিফর্ম

বাংলাদেশে অভিবাসন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় বর্হিগমন অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর দ্বারা। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, রামরু ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনসহ একটি আন্ত-মন্ত্রণালয় কমিটি ২০১০ সালে এই আইনের সংশোধিত খসড়া তৈরী করে। বাংলাদেশ আইন কমিশনের আহ্বানে রামরু, কিছু বিশিষ্ট আইনজ্ঞের সহযোগিতায় অভিবাসীর অধিকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বর্হিগমন অধ্যাদেশ ১৯৮২, আইনটি সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত করেছে। আইনটি তৈরী হবার ৩০ বছর পর সংশোধিত

হচ্ছে এবং ধরে নেয়া যায় আগামী ৩০ বছর এই আইনটি অভিবাসনকে পরিচালনা করবে। সুতরাং এই সংশোধন কার্যক্রম খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৯০ অনুস্বাক্ষরের সিদ্ধান্ড়

১৯৯৭ হতে রামরু ও ওয়ারবে ১৯৯০ এর সকল অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনটি অনুসমর্থনের জন্য Successive সরকারগুলোর কাছে দাবী করে আসছে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ এটি স্বাক্ষর করে কিন্তু তারপরে কোন সরকারই এটির অনুসমর্থন করেনি। ডিসেম্বরে UN Ratification কমিটির চেয়ারম্যান জনাব, এল. জামরি রামরুর উদ্যোগে বাংলাদেশে আসেন এবং আইন, প্রবাসী কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করেন। ১৫ ডিসেম্বর মাননীয় আইনমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ১৯৯০ কনভেনশনটি অনুসমর্থনের জন্য করণীয় সকল কাজ সরকার সমাপ্ত করেছে এবং এটি অনতিবিলম্বে মন্ত্রীপরিষদের ক্যাবিনেট কর্তৃক অনুসমর্থিত হবে।

প্রবাসী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

অভিবাসন ব্যয় নির্বাহ এবং রেমিটেন্সের উৎপাদনমুখী ব্যবহারে পুঁজির যোগান দেবার জন্য ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি প্রবাসী ব্যাংক স্থাপনের ইচ্ছা ব্যাক্ত করেন। ২০১০-এর ১৩ ডিসেম্বর এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা আইনটি অনুমোদিত হয়। ব্যাংকের মোট পুঁজির ৭৮% অভিবাসীদের Subscription অর্থ্যাৎ ওয়েজ আর্নার ওয়েলফেয়ার ফান্ড হতে সংগৃহীত হবে। এটির ব্যবহারবিধি যাতে স্বল্পমেয়াদী অভিবাসীদের লক্ষ্য করে করা হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা জর"রী।

পে-ক্যাশ exclusivity ধারা প্রত্যাহার

রেমিটেন্স স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ক্যাশ টু ক্যাশ বা স্পট ক্যাশ সিস্টেম বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই ব্যবস্থায় অভিবাসীরা ব্যাংক একাউন্ট ছাড়াই দেশে খুব দ্রুত রেমিটেন্স প্রেরণ করতে পারছেন। অভিবাসী ও তাদের পরিবার খুব দ্রুত এই ব্যবস্থাকে গ্রহন করে নিয়েছেন। কারন এই পদ্ধতিতে টাকা প্রেরণ হুন্ডির গতির সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। বিভিন্ন ব্যাংক, মানি এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে চুক্তির মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে রেমিটেন্স স্থানান্তর করে থাকে। এই পদ্ধতির ব্যাপ্তি বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল কারন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নসহ কিছু এক্সচেঞ্জ হাউজ তাদের চুক্তিতে পে-ক্যাশ exclusivity ধারা জুড়ে রেখেছিল। এই ধারার কারনে ব্যাংকসমূহ অন্য কোনো এক্সচেঞ্জ হাউজ এর সাথে অনুরূপ কোন চুক্তিতে যেতে পারতো না। কিছু এক্সচেঞ্জ হাউজ এক ধরণের মোনোপলি ব্যবসার সৃষ্টি করেছিল। গত দেড় বছরে এই ধারা প্রত্যাহার করার জন্য রামরু, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর অনুধাবন করেন যে, এই ধারা অভিবাসীর স্বার্থের পরিপন্থি, বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থি। সম্প্রতি পাকিস্থান ও নাইজেরিয়া এই ধারা তুলে নিয়েছে। গত ১১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী ব্যাংক ও মানি ট্রান্সফার এজেন্সীকে বর্তমান চুক্তি ও ভবিষ্যতের কোন চুক্তিতে এই ধারা যোগ না করতেও পরামর্শ দেয়। অভিবাসী ও সিভিল সমাজের জন্য পে ক্যাশ Exclusivity ধারা প্রত্যাহার ২০১০ এর একটি গুরুত্বপূর্ন অর্জন।

RMMRU

বিএমইটির স্মার্ট কার্ড

২০১০ সালে অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরেকটি মাইলফলক হচ্ছে বিএমইটি কর্তৃক স্মার্ট কার্ড প্রদানের মাধ্যমে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ। দূতাবাসগুলোতে অনলাইন সংযোগ না থাকাতে অভিবাসীরা এখনো এই স্মার্ট কার্ডের সুফল ভোগ করতে পারছেন না। তবে সেদিন দূরে নয় যখন অভিবাসীদের দলিলপত্র আত্মসাৎ করে তাদের প্রতারিত আর সম্ভব হবে না।

অনলাইন অভিযোগ

২০০৯ সালের মাঝামাঝি রামরু'র কারিগরি সহযোগিতায় বিএমইটি একটি অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। ঢাকার বিএমইটি অফিসে না এসে দেশ ও বিদেশ হতে সরাসরি হয়রানির প্রতিকার চেয়ে অভিবাসীরা www.ovijogbmet.org এই ওয়েবসাইটে অভিযোগ করতে পারেন। ২০১০ সালে সরকার অনলাইনে মোট ৩৩৫ অভিযোগ পেয়েছেন। এর মধ্যে ৫৯টি অভিযোগের মিমাংসা হয়েছে। মিমাংসার হার আরও অধিক হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আনার প্রতি সরকারের আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

অভিবাসনের জন্য ব্যাংক ঋণ

অভিবাসীর খরচ বহন করার জন্য ৩টি ব্যাংক ২০০৮ এর মাঝামাঝি হতে ঋণ প্রদান কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ২০১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক মাত্র ৩ জন অভিবাসীকে ১০% সুদে পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা, মার্কেন্টাইল ব্যাংক ১৫ জনকে ১৪% সুদে পনের লক্ষ টাকা এবং পূবালী ব্যাংক ৭৯ জনকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে অভিবাসন খরচ বহনের লক্ষ্যে সৃষ্ট ঋণ প্রকল্পগুলো ২০১০-এ তেমন আগায়নি। উচ্চ সুদের হার, মাঠপর্যায়ের ব্যাংক কর্মীদের সদিচ্ছার অভাব, ঋণ প্রয়োজন এমন অভিবাসীদের সংগে ব্যাংকের যোগাযোগের অভাব, ইত্যাদি এর জন্য দায়ী। এই যোগাযোগের দুরত্ব কমাতে ব্যাংকগুলো মাঠপর্যায়ের এনজিও-দের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তিতে এসে কাজ করতে পারে এবং সেই সাথে ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানো একান্ড়প্রয়োজন।

দক্ষ জনশক্তি তৈরি

অভিবাসন হতে প্রতারণা কমাতে এবং একইসাথে অভিবাসীর আয় বাড়াতে সবচাইতে সহজ উপায় হল অদক্ষ শ্রমবাজারে অংশগ্রহনের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তাদের জন্য বাজার সৃষ্টি করা। সারা বাংলাদেশে বিএমইটি-র অধীনে ৩৮টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, এর বাজেট মাত্র ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে উৎসাহিত করতে ২০০৯ এবং ২০১০ অর্থবছরে বিএমইটি ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ পেয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও তার অধীনস্থ কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে জোরদার করতে ২০১০-এ বিশেষভাবে তৎপর হয়েছে। দক্ষ জনশক্তির অভিবাসন বাড়াতে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোর্স চালু করার বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা আশু সংশোধন করা প্রয়োজন। একই সংগে মূলধারা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজীকে কর্মের ভাষায় পরিণত করে এর গুণগতমান বাড়ানোতে মনোযোগ দেয়া আগামী বছরের শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

RMMRU

জাতিসংঘের জিএফএমডিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহন

এ বছরের নভেম্বর ৭-৮ তারিখে জাতিসংঘের GFMD এর ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬০টি অভিবাসী প্রেরণকারী ও গ্রহনকারী দেশের সাথে বাংলাদেশও এতে অংশগ্রহন করে। এই গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহনের বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ঘটে। জেনেভার বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় মূল প্রবন্ধ তৈরি করে। সিভিল সমাজ গভীর বেদনার সাথে লক্ষ্য করেছে যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিভিল সমাজ এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সৃজনশীল কোন আলোচনা বা কর্মপরিকল্পনা তৈরি না করে দায়সারাভাবে GFMD তে অংশগ্রহণ করেছে। বহুপাক্ষিক সভায় অভিবাসীদের অধিকার তুলে ধরার এমন সুযোগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে এই আন্তর্জাতিক সমাবেশকে গভীর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা আমাদের সরকারের বিশেষভাবে প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালন

১৯৯৭ সাল হতে সিভিল সমাজ ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। গত তিন বছর ধরে এ দিবসটি সরকারী উদ্দ্যোগে সিভিল সমাজের সহযোগিতায় পালিত হচ্ছে। অভিবাসীদের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরতে এ বছরের এই অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান আয়োজনে সরকারের সদিচ্ছার অভাব না থাকলেও অভিবাসীদের আওয়াজ পরিপূর্ণভাবে সেখানে উঠে আসতে পারেনি। সিভিল সমাজ তাদের দাবীসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরতে পারেনি।

উপসংহার

অভিবাসনচিত্র ২০১০ পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন কাজ এ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। বর্হিগমন অধ্যাদেশ ১৯৮২-র সংশোধনের খসড়া তৈরী, প্রবাসী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ডিজিটালকরণ, পে-ক্যাশ Exclusivity ধারা প্রত্যাহার এর মাঝে অন্যতম। একইসংগে ২০১০-এর চ্যালেঞ্জগুলোও খুব তীব্র। গুরুত্বপূর্ন কিছু বাজারে ঢুকতে না পারা, অভিবাসীর কর্মী প্রেরণের হার কমে যাওয়া, রেমিটেন্স সর্বকালের মধ্যে সবচাইতে কম গ্রোথ হওয়া অন্যতম। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে সরকার ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে, আগামী ২০ বছরের Perspective Plan-এ অভিবাসনকে আরও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে। ২০১১-২০২০ দশককে অভিবাসনের দশক ঘোষণা করতে সরকারকে অনুরোধ করছি। ৭০ হাজার কোটি টাকা যে সেক্টর হতে বৈদেশিক আয়, সে সেক্টরের ব্যবস্থাপনায় ২০১১-তে সরকার আরও বেশি মনোযোগী হবে এটা আমাদের কামনা।

তথ্যসূত্র:

বিএমইটি ও বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট

Siddiqui et al (2010) Targeting Good Governance: Incorporation of Migration in the 6th Five Year Plan, RMMRU